নারী সমাজ

বাৎস্যায়ন তাঁহার কামসূত্রে গৌড়ের নারীদের মৃদুভাষিণী, অনুরাগবতী, এবং কোমলাঙ্গী বলিয়া (মৃদুভাষিণ্যোঽনুরাগবত্যো মৃদ্বঙ্গ্যশ্চগৌড়্যঃ) তৃতীয়-চতুর্থ শতকে যে উক্তি করিয়া গিয়াছেন তাহা আজও মোটামুটি সত্য বলিলে ইতিহাসের অপলাপ করা হয় না। কিন্তু বাৎস্যায়নের উক্তির ভিতর প্রাচীন বাঙালী নারীর সমগ্র ছবিটি পাইতেছিনা; সে চিত্র ফুটাইয়া তুলিবার উপাদানও অত্যন্ত স্বল্প। এই অধ্যায়ে এবং অন্যত্র প্রাচীন বাঙালী নারীর কোনো কোনো দিক সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। তাঁহাদের প্রসাধন,অলংকার বিলাস-ব্যসন সম্বন্ধে স্বল্প যাহা জানা যায়, তাহা বলিয়াছি; সভানন্দিনী-বাররামা-দেবদাসীদের সম্বন্ধে বলিয়াছি; শবরী-ডোম্বীদের জীবনযাত্রার কিছু কিছু চিত্র ধরিতে চেষ্টা করিয়াছি। সম্পন্ন, দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত নারীদের কথাও যেটুকু পাওয়া যায় বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্যে, ততটুকু বলিয়াছি। তবু, আরও যাহা বলিবার বাকি রহিয়া গেল তাহা না বলিলে ঐতিহাসিকের কর্তব্য করা হইবেনা; এই প্রসঙ্গে সে-কর্তব্য পালন করা যাইতে পারে।

গোড়াতেই বলা চলে, বৃহত্তর হিন্দুসমাজের গভীরে, (শিক্ষিত নাগর-সমাজের কথা বলিতেছি না) আজও যে সব আদর্শ, আচার ও অনুষ্ঠান সক্রিয় প্রাচীন বাঙালী সমাজেও তাহাই ছিল; যে সব সামাজিক রীতি ও অনুষ্ঠান পল্লী ও নগরবাসী সাধারণ নারীরা দৈনন্দিন জীবনে আজও পালন করিয়া থাকেন, যে সব সামাজিক বাসনা ও আদর্শ পোষণ করেন, প্রাচীন বাঙালী নারীদের মধ্যেও মোটামুটি তাহাই ছিল সক্রিয়। বাঙলার লিপিমালা ও সমসাময়িক সাহিত্যই তাহার প্রমাণ। যে অসবর্ণ বিবাহ আজও বৃহত্তর হিন্দুসমাজে প্রচলিত অথচ সুআদৃত নয়, মাঝে মাঝে তেমন ঘটিয়াও থাকে, এবং সমাজ ক্রমে সেই বিবাহ স্বীকার করিয়াও লয়, প্রাচীন বাঙলায়ও* অবস্থাটা ঠিক তাহাই ছিল। দশম-একাদশ-দ্বাদশ শতকের বাঙালী রচিত স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতে অসবর্ণ বিবাহের কোনও বিধান নাই, সবর্ণে বিবাহই ছিল সাধারণ নিয়ম, কিন্তু অসবর্ণ বিবাহ যে প্রাচীন বাঙলায় একেবারে অপ্রচলিত ছিল না তাহার প্রমাণ সমতট-রাজ লোকনাথের মাতামহ পারশব কেশব। কেশবের পিতা ছিলেন ব্রাহ্মণ কিন্তু মাতা বোধহয় ছিলেন শূদ্রকন্যা; কেশবের পারশব পরিচয়ের ইহাই কারণ। কিন্তু তাহাতে কেশবকে সমাজে কিছু হীনতা স্বীকার করিতে হয় নাই, তাঁহার কন্যা গোত্রদেবী বা দৌহিত্র লোকনাথকেও নয়। কিন্তু কেবল সপ্তম শতকেই বোধ হয় নয়, পরেও এই ধরনের অসবর্ণ বিবাহ কিছু কিছু সংঘটিত হইত; নহিলে পঞ্চদশ শতকের গোড়ায় সুলতান জলাল্-উদ্-দীন বা যদুর সভাপণ্ডিত ও মন্ত্রী বাঙালী বৃহস্পতি মিশ্র যে স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে ব্রাহ্মণের পক্ষে অন্য নিম্নতর বর্ণ হইতে স্ত্রী গ্রহণে কোনো বাধা নাই, এ বিধান দিবার কোনো প্রয়োজন হইত না।

বাঙলার পাল ও সেন আমলের লিপিগুলি পড়িলে মনে হয় লক্ষ্মীর মতো কল্যাণী, বসুধার মতো সর্বংসহা, স্বামীব্রতনিরতা নারীত্বই ছিল প্রাচীন বাঙালী নারীর চিত্তাদর্শ; বিশ্বস্তা, সহৃদয়া, ক্ষমাসমা এবং স্থৈর্য, শান্তি ও আনন্দের উৎসস্বরূপা স্ত্রী হওয়াই ছিল তাঁহাদের একান্ত কামনা। স্বামীর ইচ্ছাস্বরূপিনী হওয়াই তাঁহাদের বাসনা; এবং শামুক যেমন প্রসব করে মুক্তা তেমনই মুক্তাস্বরূপ বীর ও গুণী পুত্রের প্রসবিনী হওয়াই সকল বাসনার চরম বাসনা। বন্ধ্যা নারীর জীবন কেহই কামনা করিতেন না। লিপির পর লিপিতে এই সব কামনা, বাসনা ও আদর্শ নানা প্রসঙ্গে বারবার ব্যক্ত হইয়াছে। উচ্চকোটি শিক্ষিত সমাজে মাতা ও পত্নীর সম্মান ও মর্যাদা এই জন্যই বেশ উচ্চই ছিল, সন্দেহ নাই। লিপিগুলিতে উভয়েরই সম্বন্ধ ও সসম্মান উল্লেখ তাহার সাক্ষ্য; কোনো কোনো রাজকার্যে রাজ্ঞীর অনুমোদন গ্রহণও তাহার অন্যতম সাক্ষ্য।

সমসাময়িক নারীজীবনের আদর্শ ও কামনা লিপিমালায় আরও সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে, রামায়ণ, মহাভারত ও পৌরাণিক বিচিত্র নারীচরিত্রের সঙ্গে সমসাময়িক নারীদের তুলনায় এবং প্রাসঙ্গিক উল্লেখের ভিতর দিয়া। ধর্মপালের মাতা দেদ্দাদেবীর তুলনা করা হইয়াছে চন্দ্রদেবতার পত্নী রোহিণী, অগ্নিপত্নী স্বাহা, শিবপত্নী সর্বাণী, কুবেরপত্নী ভদ্রা, ইন্দ্রপত্নী পৌলোমী এবং বিষ্ণুপত্নী লক্ষ্মীর সঙ্গে। শ্রীচন্দ্রের পত্নী শ্রীকাঞ্চনার তুলনা করা হইয়াছে শচী, গৌরী এবং শ্রীর সঙ্গে। ধবলঘোষের পত্নী সদ্ভাবা তুলিতা হইয়াছেন ভবানী, সীতা এবং বিষ্ণুজায়া পদ্মা, এবং বিজয়সেন মহিষী বিলাসদেবী লক্ষ্মী এবং গৌরীর সঙ্গে। সমসাময়িক কামরূপ শাসনাবলীতেও এই ধরনের তুলনাগত উল্লেখ সুপ্রচুর।

মাতার কামনা ছিল শুভ্র নিষ্কলঙ্ক সুদর্শন সন্তানের জননী হওয়া; প্রসবাবস্থায় কামনানুরূপ সন্তান জন্মলাভ করে, এই বিশ্বাসও জননীর মধ্যে সক্রিয় ছিল। শ্রীচন্দ্রের রামপাল লিপিতে সুবর্ণচন্দ্রের নামকরণ সম্বন্ধে একটি সুন্দর ইঙ্গিত আছে। প্রসূতির স্বাভাবিক প্রবণতানুযায়ী সুবর্ণচন্দ্রের মাতার ইচ্ছা হইয়াছিল শুক্লপক্ষে নবোদিত চন্দ্রের পূর্ণ ব্যাসরেখা দেখিবার; তাঁহার সে ইচ্ছা পূরণ হওয়ায় তিনি সোনার মতো উজ্জ্বল অর্থাৎ সুবর্ণময় একটি চন্দ্র (অর্থাৎ সুবর্ণচন্দ্ররূপ পুত্র) দ্বারা পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। বাঙলাদেশে সাধারণ লোকদের মধ্যে এ বিশ্বাস আজও সক্রিয় যে শুক্লপক্ষের গোড়ার দিকে নবোদিত চন্দ্রের পূর্ণ গোলকরেখা প্রত্যক্ষ করিলে প্রসূতি চন্দ্রের মতো স্নিগ্ধ সুন্দর সন্তান প্রসব করেন।

সংক্রান্তি ও একাদশী তিথিতে এবং সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণে তীর্থস্নান, উপবাস এবং দানে অনেক নারীই অভ্যস্তা ছিলেন; রাজান্তঃপুরিকারাও ছিলেন। স্বামী ও স্ত্রী একই সঙ্গে দান-ধ্যান করিতেন, এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়; স্ত্রী ও মাতারা একক অনেক মূর্তি ও মন্দির ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, দান-ধ্যান করিতেছেন এ রকম সাক্ষ্যও সুপ্রচুর। রামায়ণ-মহাভারতের কথা প্রাচীন বাঙলায় সুপরিচিত ও সুপ্রচলিত ছিল,এমন কি নারীদের মধ্যেও। মদনপালের মহিষী চিত্রমতিকা দেবী বেদব্যাস-প্রোক্ত মহাভারত আনুপূর্বিক পাঠ ও ব্যাখ্যা করাইয়া শুনিয়াছিলেন, এবং নীতিপাঠক ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাস্বরূপ মদনপাল কিছু ভূমিদানও করিয়াছিলেন।

নারীরা বোধ হয় কখনও কখনও সম্পন্ন অভিজাত গৃহে শিশুধাত্রীর কাজও করিতেন! তৃতীয় গোপালদেব শৈশবে ধাত্রীর ক্রোড়ে শুইয়া খেলিয়া মানুষ হইয়াছিলেন, মদনপালের মনহলি লিপিতে এই রকম একটু ইঙ্গিত আছে। জীমূতবাহনের দায়ভাগ গ্রন্থের সাক্ষ্য প্রামাণিক হইলে স্বীকার করিতে হয়, নারীরা প্রয়োজন হইলে সূতা কাটিয়া, তাঁত বুনিয়া অথবা অন্য কোনো শিল্পকর্ম করিয়া স্বামীদের উপার্জনে সাহায্য করিতেন, কখনো কখনো অর্থলোভে প্ররোচিতা হইয়া স্ত্রীরা স্বামীদের শ্রমিকের কাজ করিতে পাঠাইতেন। এ-ব্যাপারে স্ত্রী-রা নিয়োগকর্তাদের নিকট হইতে উৎকোচ-গ্রহণে দ্বিধাবোধ করিতেন না।

একটি মাত্র স্ত্রী গ্রহণই ছিল সমাজের সাধারণ নিয়ম; সাধারণ লোকেরা তাহাই করিতেন। তবে, রাজরাজড়া, সামন্ত-মহাসামন্তদের মধ্যে, অভিজাত সমাজে, সম্পন্ন ব্রাহ্মণদের মধ্যে বহুবিবাহ একেবারে অপ্রচলিত ছিল না, এবং সপত্নী বিদ্বেষও অজ্ঞাত ছিল না। দেবপালের মুঙ্গের লিপিতে, মহীপালের বাণগড় লিপিতে সপত্নী বিদ্বেষের ইঙ্গিত আছে; আবার কোনো

কোনো লিপিতে স্বামী সমভাবে সকল স্ত্রীকেই ভালবাসিতেছেন, সে-ইঙ্গিতও আছে (ঘোষরাবা লিপি)। প্রাচীন বাঙলার লিপিমালায় বহুবিবাহের দৃষ্টান্ত সুপ্রচুর; তবে একপত্নীত্বই যে সুখী পরিবারের আদর্শ তাহা স্পষ্টই স্বীকৃত হইয়াছে তৃতীয় বিগ্রহপালের আমগাছি লিপিতে।

প্রাচীন বাঙলায়ও বৈধব্যজীবন নারীজীবনের চরম অভিশাপ বলিয়া বিবেচিত হইত। প্রথমই ঘুচিয়া যাইত সীমন্তের সিঁদুর, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমস্ত প্রসাধন-অলংকার সমস্ত সুখসম্ভোগ পড়িত খসিয়া। সাধারণভাবে প্রাচীন ভারতবর্ষের অন্যত্র যেমন, প্রাচীন বাঙলায়ও কন্যা বা স্ত্রী হিসাবে ছাড়া নারীদের ধনসম্পত্তিতে কোনো বিধি বিধানগত ব্যক্তিগত অধিকার বা সামাজিক অধিকার স্বীকৃত ছিল না। কিন্তু স্মৃতিকার জীমূতবাহন বিধান দিতেছেন, স্বামীর অবর্তমানে অপুত্রক বিধবা স্ত্রী স্বামীর সমস্ত সম্পত্তিতে পূর্ণ অধিকারের দাবি করিতে পারেন। এই প্রসঙ্গে জীমূতবাহন অন্যান্য স্মৃতিকারদের বিরুদ্ধ মতামত সব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং যাঁহারা বিধান দিতেছেন যে, বিধবা স্ত্রী শুধু খোরাকপোশাকের দাবি ছাড়া আর কিছু করিতে পারেন না, কিংবা মৃত স্বামীর ভ্রাতা এবং নিকট আত্মীয়বর্গের দাবি বিধবা-স্ত্রী-র দাবি অপেক্ষা অধিকতর বিধিসঙ্গত, তাঁহাদের বিধান সজোরে খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি অবশ্য একথা বলিয়াছেন, সম্পত্তি বিক্রয়, বন্ধক বা দানে বিধবার কোনো অধিকার নাই, এবং তিনি যদি যথার্থ বৈধব্য জীবন যাপন করেন তবেই স্বামীর সম্পত্তিতে তাঁহার অধিকার প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। বিধবাকে মৃত্যু পর্যন্ত স্বামীগৃহে স্বামীর আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে বাস করিতে হইবে, প্রসাধন-অলংকার-বিলাসবিহীন সংযত জীবন যাপন করিতে হইবে, এবং স্বামীর পরলোকগত আত্মার কল্যাণার্থে যে সব ক্রিয়াকর্মানুষ্ঠানের বিধান আছে তাহা পালন করিতে হইবে। স্বামীগৃহে যদি কোনো পুরুষ আত্মীয় না থাকেন তাহা হইলে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহাকে পিতৃগৃহে আসিয়া বাস করিতে হইবে। প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ গ্রন্থ মতে বিধবাদের মৎস্য, মাংস প্রভৃতি যে কোনো রূপ উত্তেজক পদার্থভক্ষণ নিষিদ্ধ ছিল; বৃহদ্ধর্মপুরাণের বিধানও তাহাই। বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে বিধবাদের উপস্থিতি অমঙ্গলসূচক বলিয়া তখনও পরিগণিত হইত, এবং তাঁহারা সাধারণত উৎসব ও অন্যান্য মঙ্গলানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করিতে পরিতেন না। স্বামীর চিতায় সহমরণে যাইবার জন্য তখনও ব্রাহ্মণ্যসমাজ বিধবাদের উৎসাহিত করিতেন। বৃহদ্ধর্মপুরাণে বলা হইয়াছে:

> যে স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যায় তিনি স্বামীর গুরু পাপ হইতে উদ্ধার করেন। নারীর পক্ষে ইহার চেয়ে সাহস ও বীরত্বের কাজ আর কিছু নাই; এই সহমরণের ফলেই স্ত্রী স্বর্গে গিয়া পূর্ণ এক মন্বন্তর স্বামীর সঙ্গে সহবাস করিতে পারেন। স্বামীর মৃত্যুর বহু পরেও একান্ত স্বামীগতচিত্ত হইয়া স্বামীর কোনো প্রিয় বস্তুর সঙ্গে এক অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া যে বিধবা আত্মাহুতি দিতে পারেন, তিনিও পূর্বোক্তফল প্রাপ্ত হন।

বৃহদ্ধর্মপুরাণের এই উক্তি হইতে স্পষ্টই বোঝা যায়, সতীদাহ ও সহমরণপ্রথা প্রাচীন বাঙলায়, অন্তত আদিপর্বের শেষ দিকে অজ্ঞাত ছিল না।

নারীদের যৌনশুচিতা ও সতীত্বের আদর্শ স্মৃতিকারেরা যথেষ্ট জোরের সঙ্গেই প্রচার করিয়াছেন, সন্দেহ নাই; সমাজের মোটামুটি আদর্শও তাহাই ছিল, এ বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ কম। তৎসত্ত্বেও স্বীকার করিতেই হয়, বিত্তবান্ নাগর-সমাজে তাহার ব্যতিক্রমও কম ছিল না। আর, পল্লীসমাজের যে স্তরে ব্রাহ্মণ্য আদর্শ পুরাপুরি স্বীকৃত ছিল না, আদিম কৌমগত সামাজিক আদর্শ ছিল বলবত্তর, সে স্তরে যৌনজীবনের আদর্শই ছিল অন্য মাপের, রীতিনীতিও ছিল অন্যতর। হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য সমাজাদর্শদ্বারা তাহার বিচার চলিতে পারে না। হাড়ি, ডোম, নিষাদ, শবর, পুলিন্দ, চণ্ডাল, প্রভৃতিদের বিবাহ ও যৌনজীবনের রীতিনীতি ও আদর্শ কী ছিল, তাহা জানিতে হইলে তাহা আজিকার সাঁওতাল, কোল, হো, মুণ্ডা প্রভৃতিদের ভিতর খুঁজিতে হইবে। ব্রাহ্মণ্য আদর্শ দ্বারা শাসিত সমাজেও অনিচ্ছায় বলপূর্বক ধর্ষিতা নারী তখনকার দিনেও সমাজে

পতিত বা সমাজচ্যুত বলিয়া গণ্য হইতেন না; বিধিবদ্ধ প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠানেই তাঁহার শুদ্ধি হইয়া যাইত, এ সাক্ষ্য আমরা পাই ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে। হিন্দুসমাজের নিম্নতম স্তরে বিধবা-বিবাহও একেবারে অপ্রচলিত ছিল না বলিয়াই মনে হয়।

নাগর-সমাজের উচ্চকোটি স্তরের নারীরা লেখাপড়া শিখিতেন বলিয়া মনে হয়; পবনদূত কাব্যে নারীদের প্রেমপত্র রচনার ইঙ্গিত আছে। নানা কলাবিদ্যায় নিপুণতাও তাঁহাদের অর্জন করিতে হইত, বিশেষভাবে নৃত্যগীতে। নট গাঙ্গো বা গাঙ্গোকের পুত্রবধূ বিদ্যুৎপ্রভা সম্বন্ধে সেক শুভোদয়ায় যে সুন্দর গল্পটি আছে তাহাই এই উক্তির সাক্ষ্য। জয়দেব পত্নী পদ্মাবতীও নৃত্যগীতে সুদক্ষা ছিলেন।

বাৎস্যায়নের সাক্ষ্যে মনে হয়, প্রাচীন বাঙলার রাজান্তঃপুরের মেয়েরা স্বাধীনভাবে চলাফেরায় খুব অভ্যস্ত ছিলেন না; পর্দার আড়াল হইতে তাঁহারা অপরিচিত পুরুষদের সঙ্গে কথাবার্তা বলিতেন। অন্তঃপুরে অবগুণ্ঠনময়ীর জীবনই সমাজের উচ্চকোটি স্তরে সাধারণ নিয়ম ছিল বলিয়া মনে করিবার হেতু বিদ্যমান। লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগর লিপিতে রাজান্তঃপুরের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। কেশবসেনের ইদিলপুর লিপিতে আছে, বল্লাল সেন তাঁহার বিজিত শত্রুর রাজলক্ষ্মীকে জয় করিয়া আনিয়াছিলেন পাল্কীতে বহন করিয়া। মনে হয়, সম্ভ্রান্ত মহিলারা পথে ঘাটে যাতায়াতকালে পথযাত্রীদের দৃষ্টি হইতে নিজেদের আড়াল করিয়াই চলিতেন। কেশবসেন সুপুরুষ ছিলেন; তাঁহার ইদিলপুর লিপিতে দেখিতেছি, তিনি যখন রাজপথে বাহির হইতেন, পৌরসীমন্তিনীরা সৌধশিখরে উঠিয়া তাঁহার রূপ নিরীক্ষণ করিতেন। কিন্তু, পবনদূতে বিজয়পুরের মহিলাদের যে বর্ণনা পাইতেছি তাহাতে মনে হয়, তাঁহাদের অবগুণ্ঠনের বালাই খুব বেশি ছিলনা। সম্ভ্রান্ত স্তরে যাহাই হউক, সমাজের যে স্তরে নারীদের, হাটে-মাঠে-ঘাটে খাটিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে হইত, নানা কাজে কর্মে শারীরিক শ্রম করিতে হইত তাঁহাদের মধ্যে অবগুণ্ঠিত জীবনযাপনের কোনও সুযোগই ছিলনা প্রয়োজনও ছিল না, সে আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাও ছিল না। মধ্যবিত্ত কুলমহিলারা অবগুণ্ঠন দিতেন; বস্তুত, অবগুণ্ঠন ছিল তাঁহাদের কুলমর্যাদা জ্ঞাপনের অন্যতম অভিজ্ঞান। এই মধ্যবিত্ত কুলমহিলাদের জীবনচর্যার একটি সুন্দরছবি রাখিয়া গিয়াছেন কবি লক্ষ্মীধর।

শিরোযদবগুণ্ঠিতং সহজরূঢ়লজ্জানতং
গতং চ পরিমন্থরং চরণকোটিলগ্নে দৃশৌ॥
বচঃ পরিমিতং চ যন্মধুরমন্দমন্দাক্ষরং
নিজং তদিয়মঙ্গনা বদতি নূনমুচ্চৈঃ কুলম্॥

অবগুণ্ঠিত শির স্বতই লজ্জানত, গমন মন্থর দৃষ্টি পায়ে নিবদ্ধ, বাক্য পরিমিত এবং মৃদুমধুর—এই সব দ্বারা এই মহিলা যেন উচ্চস্বরে নিজের কুলমর্যাদা প্রকাশ করিতেছেন।

বাঙলার কবি উমাপতিধর বাঙালী নারীর সুন্দর একটি প্রাকৃত অথচ অনন্যসাধারণ ছবি আঁকিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, এবং সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থে তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে। এই ছবিটি উদ্ধার করিয়াই এই অধ্যায়ের আলোচনা শেষ করা যাইতে পারে। একবসনা পল্লীবাসিনী বাঙালী নারী বনের মধ্যে ঢুকিয়াছেন ফুল আহরণের জন্য; একটু উঁচুতে নাগালের বাইরে গাছের ডালে ফুল ফুটিয়া আছে, পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া বাহু উপরের দিকে তুলিয়া সুন্দরী ফুল পাড়িতেছেন; নাভিহ্রদ বসনমুক্ত, একদিকের স্তন প্রকাশিত। সুন্দর অনবদ্য কাব্যময়তায় উমাপতিধর ছবি আঁকিয়াছেন:

দূরোদঞ্চিত বাহুমূলবিলসচ্চীন প্রকাশ স্তনা—
ভোগব্যয়ত মধ্যলম্বিবসনানির্মুক্ত নাভিহ্রদা।
আকৃষ্টোজ্জিত-পুষ্প মঞ্জরিরজঃ পাতাবরুদ্ধেক্ষনা
চিন্বত্যাঃ কুসুমং ধিনোতি সুদৃশঃ পাদাগ্র-দুস্থা তনুঃ॥